স্কুলব্যাগটি উধাও করতে চাই

মোস্তাফা জব্বার

২০১৪ সালের নভেম্বরে একটি দৈনিক পত্রিকায় একটি শীর্ষ সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এতে বলা হয়, আমাদের শিশুদের স্কুলব্যাগটা বড্ড ভারি। এরা জরিপে দেখিয়েছে, ১৫-২০ কেজি ওজনের শিশুকে ৬ থেকে ৮ কেজি ওজনের স্কুলব্যাগ বহন করতে হয়। এরাই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বলেছে, শিশুর মোট ওজনের শতকরা দশ ভাগের বেশি ওজনের ব্যাগ তার কাঁধে দেয়া উচিত নয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতে পারে। এরা নানা পরামর্শ দিয়ে বলেছে, শিশুর বই কমিয়ে, স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে, খাতার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ব্যাগের ওজন কমানো যায়। প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এসব চিন্তাভাবনা নিয়ে সামনে এগোনো যায়। কিন্তু কার্যত শিশুদের বইয়ের ওজন, খাতার ওজন বা পানির বোতল কোনোটাই কমবে না। বরং যদি ব্যাগটির ওজন আরও বাড়ে, তবে তাতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ফলে ব্যাগের ওজন বাড়ার এই সমস্যার সমাধানও তাই পাঠক্রম কমানোতে বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পথেই হবে না।

নব্বই দশকেও আমার সম্পাদিত একটি পত্রিকায় শিশুদের ওজনদার স্কুলব্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম। প্রস্তাব করেছিলাম– শিশুদেরকে যেন তথাকথিত বিদ্যার ওজনে পিষ্ট না করা হয়। এসব কথা সরকারের শিক্ষানীতিতে আছে। সরকারিভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিনে দিনে বই এবং বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে শিশুরা পড়ে ৬টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে যে শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনোভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়? দুনিয়ার কোনো শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কি এমন পরামর্শ দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সরকার সেই কাজটি করেছে। শুধু কি তাই– সরকারি পাঠক্রমে যে পরিমাণ বই বা পাঠক্রম আছে বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম এমনকি মাদ্রাসারও বই বা পাঠক্রম অনেক বেশি। শিশুশ্রেণির একটি শিশুর যেখানে খেলায় খেলায় পড়ার কথা, সেখানে তাকে বইয়ের পর বই চাপিয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কমিশন পাওয়ার জন্য বাড়তি বই পাঠ্য করা হয়।

আমি মনে করি, স্কুলব্যাগের ওজন কমানোটা সমাধান নয়। বরং এখন দুনিয়ার সর্বত্র স্কুলব্যাগ উধাও করার প্রচেষ্টা চলছে। ডেনমার্কের স্কুলে বই দিয়ে লেখাপড়া করানো হয় না। সিঙ্গাপুরের ছেলেমেয়েরা আইপ্যাড দিয়ে পড়াশোনা করে। মালয়েশিয়ার স্মার্টস্কুলগুলোতে কাগজের বই কোনো প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গই নয়। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো সম্পর্কে ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ওই দৈনিক পত্রিকায় আরও একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির অংশবিশেষ দেখেই বলা যাবে ভারি ওজনের স্কুলব্যাগের উধাও করাটাই সমাধান।

খবরটির শিরোনাম– যুক্তরাজ্যের ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ট্যাবলেট। খবরটি এরকম : 'যুক্তরাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ট্যাবলেট কমপিউটার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তির সুবিধা দিতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুবিধা নিতে ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর সে জন্যই বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেট কমপিউটার দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণার অংশ হিসেবে ৬৭১টি বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়। বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেটের এমন ব্যবহার বাড়ার ফলে প্রযুক্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাসা এবং বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির নানা সুবিধাও ব্যবহার করছে শিক্ষার্থীরা। বার্বি ক্লাক অব দ্য ফ্যামিলি, কিডস অ্যান্ড ইয়ুথ রিসার্চ গ্রুপের করা এ গবেষণায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৬৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৯ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে বাসায় প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ শিক্ষার্থী ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট ব্যবহারের এমন হার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেশ সহায়তা করছে বলে জানিয়েছে গবেষক দল। যে হারে এ সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ২০১৬ সালের মধ্যে ট্যাবলেট ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে হবে ৯ লাখ। চলতি বছরে এ সংখ্যা হলো ৪ লাখ ৩০ হাজার।' যুক্তরাজ্যের শিশুদের এই পরিসংখ্যান বস্তুত একটি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

ছবি : ইন্টারনেট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি বলেছিলেন, তিনি এদেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে ল্যাপটপ নিয়ে স্কুলে যেতে দেখতে চান। স্বপ্ন দেখার এই মানুষটি ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করে বস্তুত দেশটির আগামী দিনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর কথা কেউ শুনে না। আমি ভীষণভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম যখন শুনেছিলাম, আমাদের ক্লাসরুমগুলো মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হচ্ছে। সেই কবে থেকে চিৎকার করছি– শিক্ষায় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করুন। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর গাজীপুরে মাল্টিমিডিয়া স্কুলেরও উদ্বোধন করেছি। সেই কবে থেকে শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করছি। সেই কবে থেকে মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। যত দেন-দরবার করা দরকার সেইসব করছি। তবুও কাউকেই বোঝাতে পারিনি, কাগজ-কলম-চক-ডাস্টারের দিন শেষ। যখন দেখলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকার এক লাফে ২০ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তুলছে, তখন আমার আনন্দ আর কে দেখে। কিন্তু প্রথম হোঁচট খেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম এই প্রকল্পে বাংলা লেখার কোনো সফটওয়্যারই নেয়া হয়নি। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম– এর মানে কি, এইসব ক্লাসরুমে বাংলা লেখা হবে না? ওরা সবাই কি ইংরেজি মাধ্যমে পড়বে এবং এমনকি বাংলাকে একটি ভাষা হিসেবেও পড়বে না? জবাব পেয়েছিলাম– না, বাংলা লেখা হবে, তবে সেটি রোমান হরফ দিয়ে। এরপর আরও জানলাম, এই প্রকল্পে যেসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেগুলোতেও রোমান হরফেই বাংলা লেখা শেখানো হয়েছে। বুঝেছিলাম, বরকত-সালাম-রফিক-জব্বারের যোগ্য উত্তরসূরিরাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরপর আর তেমন কোনো কথা বলিনি। সেদিন হঠাৎ করে দেখি একটি পত্রিকায় সেই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম খবর হয়েছে। তেমন খবর না পড়ে কি পারা যায়!

আরেকটি দৈনিকের ১৮ অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় ৩-এর পাতায় লেখা 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যকরের বিশেষ উদ্যোগ' শিরোনামে একটি ছোট খবর ছাপা হয়েছে। খবরটি বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে। যাদের আগ্রহ আছে তাদের নজরে পড়ার কথা। খবরটি এরকম, 'সারা দেশে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সরকার। ২০

(বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়)